অনর্গল কথা নাকি শব্দহীন কাটানো মুহূর্ত, কোনটিতে সম্পর্ক মজবুত হয়?

দাম্পত্য জীবনে সুখী থাকার ফর্মুলা কী, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে নানা জনে নানা কথা বলবেন। মনোবিদদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, সম্পর্ক ভালো রাখতে, মন খুলে কথা বলা জরুরি। কারও আবার মত, ঝগড়া করলে, মনের জমা অভিমান, ক্ষোভ বের করে দিলেও দুই মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া দূরত্ব কমে যেতে পারে। সম্পর্ক থাকলে ঝগড়া, মান-অভিমান থাকবেই। থাকবে ভালবাসাও। তবে সব সময় মনের কথা কি শব্দেই প্রকাশ করতে হবে?

মনোবিদেরা অনেক সময় বলেন, বহু কথায় যে কাজ হয় না, হাজার কথাতেও যা বোঝানো যায় না, সেই কাজ করে দিতে পারে নীরবতা। নৈঃশব্দ্যেরও ভাষা হয়।

সেই ভাষার কথাই প্রকাশিত হল সাম্প্রতিক সমীক্ষায়। দিনের শেষে পরস্পরের সঙ্গে অনর্গল কথা নয়, বরং শব্দহীন কাটানো মুহূর্তই বাড়িয়ে দিতে পারে দুটি মানুষের মনের যোগসূত্র, বলছে ব্রিটেনের দি ইউনিভার্সিটি অফ রিডিং-এর সমীক্ষা।

তবে রাগ, অভিমানে কথা বন্ধ করে দেওয়া নয়, নিঃশব্দে সঙ্গীর সঙ্গে সুন্দর মুহূর্ত কাটানোর কথাই উঠে এসেছে এখানে। নৈঃশব্দ্য দুটি মানুষের সংযোগের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, তা জানার জন্য, মনোজগতে তার প্রভাবের আভাস পেতেই সমীক্ষার সূচনা। ‘মোটিভেশন অ্যান্ড ইমোশন’ নামে জার্নালে প্রকাশিত সেই সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, একেবারে চুপ করে একে অন্যের সঙ্গে বসে থেকেও সেই মুহূর্তকে উপভোগ করা এক সুন্দর সুস্থ সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়।

মনে প্রশ্ন উঠতেই পারে, তবে কি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেবেন? মান-অভিমান না মিটিয়ে নৈঃশব্দ্যের পন্থাকেই শ্রেয় মনে করবেন? অনেক সময়েই দু’জন মানুষের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। বন্ধ হয়ে যায় কথা। সেই নীরবতাও কি তবে সম্পর্ক মজবুত করতে পারে?

সমীক্ষার জন্য বেশ কিছু দম্পতিকে বলা হয়েছিল কথা না বলে চুপ থাকতে। এক দলকে বলা হয়েছিল, নীরব থাকার সময় অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে করতে। বিরক্ত হলে যেমন কেউ কথা বলতে চান না, তেমন মানসিকতা থেকে বিষয়টি দেখতে বলা হয়েছিল। আর এক দলকে বলা হয়েছিল, শাস্তি দেওয়া হয়েছে, এমন মনোভাব নিয়ে চুপ থাকতে। আর এক দল নৈঃশব্দ্যকে তাদের সঙ্গীর সঙ্গে উপভোগ করেছিলেন।

সমীক্ষকেরা দেখেন, রাগ, অভিমান বা তিক্ত কথা স্মরণ করে নীরব থাকায় মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। অন্যদিকে, কোনো তিক্ত মানসিকতা ছাড়া স্বাভাবিক ভাবে নীরব থাকা পরস্পরের মধ্যে সংযোগ বাড়িয়েছে।

দলের মুখ্য সমীক্ষক নেট্টা ওয়েনস্টাইন বলছেন, অসন্তোষ নয়, বরং ভালবাসা, অন্তরঙ্গতার ভাষার কথাই এ ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে।’’ নীরবতায় স্বতঃস্ফূর্ততা থাকা দরকার, জানাচ্ছেন তিনি। অন্তরঙ্গতা না থাকলেও, অশান্তি ছাড়া দু’জন মানুষের মধ্যে নিঃশব্দে কাটানো সময়ও অর্থবহ, সুম্পর্কের ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠতে পারে, বলছে এই সমীক্ষা।

তবে আমেরিকার নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানী ক্লডিয়া হ্যাসে অবশ্য এই সমীক্ষার ফলাফলকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। তার বক্তব্য, ‘উদ্দেশ্যপূর্ণ নীরব সংযোগই দাম্পত্যে মাধুর্য এনে দিতে পারে। দু’জন একসঙ্গে গান শুনছেন, হাইকিং করছেন, নীরব থেকেও যখন দু’জনেই সেই মুহূর্ত উপভোগ করছেন তখন তাদের মধ্যে ভালবাসা, বন্ধন দৃঢ় হয়।’

তবে নেট্টার কথায়, সব সময় দু’টি মানুষের মধ্যে কথার প্রয়োজন হয় না, বরং নৈঃশব্দ্যই অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে অনেক ক্ষেত্রে।

সূত্র: যুগান্তর

রাতে দেরিতে খাওয়ার অভ্যাস? জানুন কী হয়

দৈনন্দিন জীবনে খাদ্যাভ্যাসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে কিংবা অভ্যাসবশত অনেকেই রাতে দেরিতে খাবার খেয়ে থাকেন। বিশেষ করে শহুরে জীবন, অফিসের ব্যস্ততা, কিংবা বিনোদনের কারণে অনেকেই নিয়মিত রাত ১১টা বা তারও পরে রাতের খাবার খেয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছে, এই অভ্যাস শরীরের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে।

ঘুমের ব্যাঘাত থেকে শুরু করে ওজন বৃদ্ধি এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। তাই যাদের রাতে দেরিতে খাবার অভ্যাস, তাদের এখনি উচিত নতুন করে খাবারের সময় ঠিক করা। মাঝে মাঝে দেরিতে খাবার খেলে তেমন কোনও ক্ষতি নেই, তবে প্রতিদিন যদি রাত ৯ টার পর খাবার খাওয়া হয় , তবে তা স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

ওজন বৃদ্ধির ঝুঁকি: যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পেরেলম্যান স্কুল অব মেডিসিন পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা রাতে দেরিতে খায়, তাদের শরীরে বেশি ক্যালরি জমা হয় এবং ওজন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কারণ, রাতে খাওয়া খাবার সহজে হজম হয় না, ফলে এটি চর্বি হিসেবে জমতে থাকে। আমাদের শরীর সূর্যের আলোর সঙ্গে যুক্ত। তাই আমরা যত দেরিতে খাই, খাবার তত বেশি আমদের অন্ত্রে থেকে যায়। যা হজমকে প্রভাবিত করে। যেহেতু সন্ধ্যার পর থেকেই বিপাক ক্রিয়া আস্তে আস্তে ধীর হয়ে যায়, তাই রাতের খাবার চর্বিতে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থেকে। যার ফলে ধীরে ধীরে শরীরের অবাঞ্ছিত ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে।

ঘুমের ব্যাঘাত: খাওয়ার পরপরই শুয়ে পড়লে শরীরের বিপাকক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না, ফলে অনিদ্রা বা ঘুমের ব্যাঘাত দেখা দিতে পারে। এছাড়াও দেরিতে খাবার খেলে অদ্ভুত স্বপ্নও দেখতে পারেন।

২০১৫ সালে দুই কানাডিয়ান মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর একটি গবেষণা চালিয়েছে। যার ফলাফলে দেখা গেছে যে ছাত্রগুলো দেরিতে রাতের খাবার খায় তাদের অস্বাভিক স্বপ্ন দেখার

সম্ভাবনা বেশি। বিশ্রামের সময় খাবার হজম করতে শরীরের সমস্যা হওয়ার কারণেও এটি হতে পারে।

এছাড়াও পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পেরেলম্যান স্কুল অফ মেডিসিনের গবেষণা সহযোগী অধ্যাপক নামনি গোয়েল বলেন, দেরিতে খাওয়ার ফলে হরমোন চিহ্নিতকারীর নেগেটিভ প্রোফাইল তৈরি হতে পারে, যেমন উচ্চ গ্লুকোজ এবং ইনসুলিন, যা ডায়াবেটিসের সঙ্গে জড়িত। কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইড, যা হৃদরোগের সমস্যা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যগত অবস্থার সঙ্গে যুক্ত।

দুর্বল হজম: রাতে দেরিতে খেলে খাবার যথাযথভাবে হজম হতে পারে না। ঘুমাতে যাবার কিছুক্ষণ সময় আগে খাবার খেলে পাকস্থলী স্বাভাবিকভাবে হজমের কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, ফলে অম্লতা, গ্যাস, বুক জ্বালা ও বদহজমের সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও এতে দীর্ঘমেয়াদী পাকস্থলীর সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

হৃদরোগ এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বেশি: এছাড়াও রাতে দেরিতে খাওয়ার ফলে উচ্চ রক্তচাপসহ বিভিন্ন রোগ ভুগতে হয়। এমনকি এটি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে যারা থাইরয়েড রোগ, পিসিও-ডি এবং উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য এটি আরও ক্ষতিকর হতে পারে।

আমরা আমাদের রাতের খাবারে সোডিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেতে অভ্যস্ত। শাক-সবজি শুরু করে মাছ-মাংস পর্যন্ত, আমাদের খাবারে প্রায়শই উচ্চমাত্রার লবণের মাত্রা থাকে। রাতের বেলা এই লবণাক্ত খাবার খাওয়ার ফলে এটি উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়।

ডায়াবেটিসের ঝুঁকি:
আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, রাতের খাবার দেরিতে খাওয়ার ফলে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বাড়তে পারে, যা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। বিশেষ করে মিষ্টি বা কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার দেরিতে খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

রোগ প্রতিরোগ ক্ষমতা হ্রাস: রাতে দেরি করে খেলে দেহে ফ্রি রেডিক্যাল বেড়ে গিয়ে কোষের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়। এ ছাড়া এতে রোগ প্রতিরোগ ক্ষমতা কমে যায়, ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

লাবণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়া: রাতে দেরি করে খেলে বৃদ্ধিজনিত হরমোনের উৎপাদন ব্যাহত হয়। এতে বিপাকের বিঘ্ন ঘটে শরীরের লাবণ্য নষ্ট হয়।

আদর্শ রাতের খাবারের সময় স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন যে রাতের খাবারের জন্য সর্বোত্তম সময় হল সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে, যা শরীরকে ঘুমানোর আগে খাবার হজম করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়।

খাবারের তালিকায়, হালকা ও সহজপাচ্য খাবার বেছে নিন। পর্যাপ্ত পানি পান করুন এবং খাওয়ার পরপরই না শুয়ে কিছুক্ষণ হাঁটুন। সুস্থ থাকতে হলে সঠিক সময়ে সুষম খাবার খাওয়া এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া জরুরি। তাই সময়মত খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং সুস্থ জীবনযাপন করুন!

সূত্র: ইত্তেফাক

চট্টগ্রামের মেজবান, আপনি যেভাবে খেতে পারেন

চট্টগ্রামের মেজবান। এই মেজবানের কথা মানুষের মুখে মুখে প্রায়ই শোনা যায়। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বাইরের জেলার কোন লোক একবার খাওয়ার সুযোগ পেলে আর ভুলতেই চান না এই মাংসের স্বাদ। কিন্তু কি আছে এতে?

অনেকের বাড়িতে গরুর মাংস রান্না হয়। প্রায়ই মানুষের এটাই পছন্দের খাবার। সুস্বাদু ও মুখরোচক খাবার। অনেকে অনেকভাবে রান্না করেন এই গরুর মাংস। কিন্তু চট্টগ্রামের মেজবানির মতো হয় না কেন?

চট্টগ্রামের মানুষেরা বলে থাকেন, মেজবানির রান্না সবচেয়ে আলাদা। নিজেদের বাড়িতে যে মাংস রান্না হয় তার সঙ্গে মেজবানির অনেক তফাৎ। সম্পূর্ণ আলাদাভাবে মেজবানির মাংস রান্না করা হয়।

চট্টগ্রামের মেজবান কী?

দেশব্যাপী চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানের বেশ খ্যাতি রয়েছে। এই মেজবান দেশ পেরিয়ে দেশের বাইরেও পৌঁছে গেছে। দেশের বাইরে অবস্থানরত প্রবাসিরা মাঝেমধ্যে মেজবানির আয়োজন করে থাকেন।

জানা যায়, মেজবান শব্দটি একটি ফারসি শব্দ। এই মেজবানকে চট্টগ্রামে মেজ্জান বলা হয়। ১৮ দশক থেকে চট্টগ্রামে মেজবানের প্রচলন শুরু হয়ে আসছে। যেখানে চট্টগ্রামের ধনীরা বিভিন্ন উত্সবে গরিব লোকদের উন্নতমানের খাবারের আয়োজন করতেন। সেই থেকে মেজবানের প্রচলন। যা এখনও রয়েছে। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বাইরে অন্য জেলায় এই মেজবানকে জেয়াফত বলা হয়।

সাধারণত কারো মৃত্যুবার্ষিকী, কুলখানি, চল্লিশা, ওরশ শরিফ, মিলাদ মাহফিল, সন্তানের আকিকা, গায়ে হলুদ, নতুন ঘরে ওঠা অথবা নতুন ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু করার আগে মেজবানের আয়োজন করা হয়।

মেজবানের আয়োজনে থাকে- রান্না করা গরুর মাংস, চনার ডাল, গরুর নলা, মাষকলাই ডাল, গরুর কালোভুনা। মজাদার মেজবানি খাবারের প্রতি ধনী-গরিব সবারই লোভ থাকে।

ঘরে বসে আপনিও করতে পারেন মেজবানির মাংস রান্না। তাতে কিছু স্পেশাল মশলা ব্যবহার করতে হয়। জেনে নিন কিভাবে মেজবানির গোস্ত রান্না করবেন। এক কেজি গরুর গোস্ত দিয়ে মেজবানির রান্নায় কী কী উপকরণ লাগে-

উপকরণ

গরুর মাংস ১ কেজি

তেল পরিমাণ মতো

পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ

আদা বাটা ২ টেবিল চামচ

রসুন বাটা ৩ টেবিল চামচ

জিরার গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ

মরিচের গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ

হলুদের গুঁড়ো আধা টেবিল চামচ

লবণ স্বাদমতো

মসলার গুঁড়ো ৪ টেবিল চামচ

তেজপাতা ৪ থেকে ৫টি

দারুচিনি ৪টি

এলাচ ৫ থেকে ৬টি

লবঙ্গ ৬ থেকে ৭টি

পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ

সরিষার তেল ৪ টেবিল চামচ

যেভাবে রান্না করবেন

মাংসগুলো ভালোভাবে ধুয়ে একটি বড় বাটিতে নিন। এতে পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, জিরার গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, লবণ ও স্পেশাল মসলার গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে মেরিনেট করুন।

এবার রান্নার পাতিলে পরিমাণমতো তেল দিন। তেল গরম করে এতে তেজপাতা, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, পেঁয়াজ কুচি, লবণ, মেরিনেট করা মাংস, পানি ও সরিষার তেল দিয়ে কষিয়ে ফেলুন। ভালোভাবে কষানোর পর পরিমাণ মতো ফুটন্ত পানি দিন এবং পর্যাপ্ত সময় নিয়ে গোস্ত রান্না করুন। তাহলেই হয়ে যাবে মেজবানির মাংসের স্বাদ।

রান্না হয়ে গেলে গরম ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে স্বাদের মেজবানির মাংস খেতে পারেন।

সূত্র: যুগান্তর

চুল পড়া দূর করতে দ্রুতই তিনটি নিয়ম পালন করুন

আপনার চুল পড়ার কোনো মৌসুম নেই। আপনি সেটা খুব ভালো করেই জানেন। তাই শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব ঋতুতেই চুল পড়তে থাকে। শতচেষ্টাতেও এ সমস্যা থেকে সবসময় রেহাই পাওয়া যায় না। আপনার চুল পড়া রক্ষায় নামি সংস্থার দামি প্রসাধনীও ব্যর্থ হয়। আবার ঘরোয়া টোটকার ব্যবহার করেও সুফল মেলেনি এমন উদাহরণ বহু রয়েছে। শুধু ঝরে পড়া নয়, নিষ্প্রাণও হয়ে পড়ে চুল। যদি কোনো চেষ্টা কাজে না আসে, তা হলে কীভাবে করবেন চুলের পরিচর্যা?

চলুন জেনে নেওয়া যাক আপনার চুল পড়া রক্ষায় কি করণীয়

ময়েশ্চারাইজিং

শুধু যে ত্বকের ময়েশ্চারাইজার প্রয়োজন হয়, সেটি একেবারেই নয়। চুলের চাই আর্দ্রতা। আর তার জন্য ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার জরুরি। মাথার ত্বকে আর্দ্রতার ঘাটতি চুল ঝরার পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে। তাই অলিভ অয়েল, কাঠবাদামের তেল ভালো করে মালিশ করুন। তাতে আপনি অনেক সুবিধা পাবেন।

স্টিম

নিজের হাতেই ফেস স্ক্রাব বানিয়ে মাখুন, দুই মিনিটে পাবেন মোলায়েম ত্বক। তাই মাথার ত্বকের আর্দ্রতা ফেরাতে গরম ভাপ নেওয়া জরুরি। বাড়িতেই সেটা নেওয়া সম্ভব। শ্যাম্পু করার পর গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে নিংড়ে নিয়ে মাথায় জড়িয়ে রাখুন কিছু সময়। মাঝেমাঝে এই স্টিম নিলে মাথার ত্বকে তেল পৌঁছাবে ভালোমতো। সেই সঙ্গে আর্দ্রও থাকবে মাথার তালু।

তেলের ব্যবহার

চুল ভালো রাখতে চাইলে তেল দূরে সরিয়ে রাখলে চলবে না। তেলের গুণেই চুল থাকবে ঝলমলে, মসৃণ ও কোমল। তা ছাড়া চুলের গোড়া মজবুত করতেও তেলের ভূমিকা অনবদ্য। নিয়মিত তেল না মাখলে চুলের গোড়া শক্ত হবে না।

সূত্র: যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

তারা।

৪. চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী

এই পেশাজীবীদের কাছে সব সময় প্রথম প্রাধান্য থাকে রোগী, জীবনসঙ্গী নয়। এই পেশাজীবীরা খুব কমই সঙ্গী বা পরিবারকে সময় দিতে পারেন। তারা অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গীর মানসিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হন।

৫. গেমিং সার্ভিসেস ওয়ার্কার

যারা ক্যাসিনোতে কাজ করেন বা জুয়ার সঙ্গে যুক্ত, তাদের জীবনযাপনের ধরনের কারণে তাদের জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়।

৬. ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্টস

অনেকের কাছে খুবই আকর্ষণীয় চাকরি। এই পেশাজীবীরা বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পান। বেতনও তুলনামূলকভাবে ভালো। তবে আপনার কাছে যতই আকর্ষণীয় আর গ্ল্যামারাস লাগুক না কেন, পেশাটি কম চাপের নয়। ক্রমাগত ভ্রমণের ফলে তারা শারীরিক আর মানসিকভাবে ক্লান্ত থাকেন। লম্বা সময় পরিবার থেকে দূরে থাকা ও ‘লং ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ’ চালিয়ে নেওয়া সহজ কথা নয়।

৭. কাস্টমার কেয়ার, টেলিমার্কেটের ও সুইচবোর্ড অপারেটর

এই পেশাজীবীরা সব সময় চেয়ারে বসে থাকেন। পুরোটা সময় ফোনে কথা বলেন। ফোনের অপর পাশের ব্যক্তির ঝাড়ি খান, গালি খান। ঠান্ডা মাথায় মানুষের সমস্যার সমাধানও দিতে হয়। ফলে তারা মানসিক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকেন। মানসিক চাপ থাকে ভীষণ। ফলে জীবন থেকে সুখ বিষয়টা দূরে চলে যায়। আর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সম্পর্কে। তাদের নিয়মিত কাউন্সেলিং প্রয়োজন।

আপনি এর পরেরবার যখন তাদের কারও সঙ্গে বিভিন্ন সেবা নিয়ে আপনার বাজে অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা বলবেন, যথাসম্ভব নরম স্বরে কথা বলুন। মনে রাখবেন, আপনার ভোগান্তি বা অসুবিধার জন্য তারা দায়ী নন। তারা কেবল জীবন চালানোর জন্য চাকরি করছেন।

৮. ডান্সার ও কোরিওগ্রাফার

বিশেষ করে ব্যালে ডান্সারদের মধ্যে বিচ্ছেদের হার সর্বোচ্চ।

পেশাজীবনে সর্বোচ্চ সফলতার দেখা পাওয়ার জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তাদের ফিটনেস বজায় রাখা খুবই জরুরি। শরীরে ব্যথা, ফ্র্যাকচার, লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া, হাড় ভাঙা—এ রকম নানা শারীরিক সমস্যায় ভোগেন তারা। নিজেদের শরীর নিয়ে হীনম্মন্যতা ও অসন্তুষ্টিতে ভোগার হারও তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই পেশাজীবীরাই সবচেয়ে বেশি ‘ইটিং ডিজঅর্ডার’–এ ভোগেন। তাদের একটা বড় অংশ অসুখী। তাই তাদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে অপর ব্যক্তি যে সুখী হবেন না, এটাই তো স্বাভাবিক!

৯. ম্যাসাজ থেরাপিস্ট

জীবনসঙ্গীরা এই পেশাজীবীদের পেশা নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় ভোগেন।

১০. টেক্সটাইল নিটিং ও ওয়েভিং মেশিন অপারেটর

তাঁরা চাকরিজীবন নিয়ে মোটেও সন্তুষ্ট নন। শারীরিক ও মানসিকভাবে ভীষণ ক্লান্তি নিয়ে ঘরে ফেরেন। এটা তাদের মানসিক চাপ বাড়ায়। এর প্রভাব পড়ে মেজাজ, মানসিক স্বাস্থ্য ও সম্পর্কে।

আপেল, না আপেল জুস কোনটি বেশি স্বাস্থ্যকর?

ফল হিসেবে আপেল পছন্দের শীর্ষে। পুষ্টিগুণে ভরপুর, খেতেও বেশ সুস্বাদু। অনেকে জুস করে পছন্দ করেন আপেল। আপেল ফল হিসেবে নাকি জুস হিসেবে বেশি স্বাস্থ্যকর।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আপেল জুস পান করার থেকে পুরো আপেল খাওয়া সবসময়ই বেশি উপকারী। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুমিত রাওয়াত বলেছেন, আপেল লোহিত (আয়রন) সমৃদ্ধ, যা রক্তের হিমোগ্লোবিনের স্তর বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং রক্ত স্বল্পতা প্রতিরোধ করতে পারে। তিনি বলেন, প্রতিদিন একটি লাল বা সবুজ আপেল খাওয়া ইমিউনিটি শক্তিশালী করে এবং বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।

ডা. সুমিত রাওয়াত বলেন, আপেলের খোসায় উপস্থিত পোট্রিন এবং অন্যান্য এনজাইম হজমের জন্য অত্যন্ত উপকারী, যা কোষ্ঠকাঠিন্য ও গ্যাসের মতো সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে। তবে আপেল জুস পান করলে রক্তের শর্করার পরিমাণ দ্রুত বাড়তে থাকে, যা যকৃতে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। অন্যদিকে পুরো আপেল খেলে এ সমস্যা সৃষ্টি হয় না।

তাহলে আপেল খাওয়ার অনেক উপকারিতা আছে, যা তার জুসের তুলনায় অনেক বেশি। পরবর্তী বার যখন আপেল জুস খাওয়ার ইচ্ছা হবে, তখন পুরো আপেলটি খাওয়ার কথা ভাবুন। আর আপেলের স্বাস্থ্য উপকারিতা ভোগ করতে চাইলে, পুরো আপেল খাওয়াই হবে সেরা পছন্দ বলে জানান এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

সূত্র: যুগান্তর

প্রতিদিন অন্তত ১০ মিনিট খালি পায়ে ঘাসে হাঁটলে পাবেন যেসব উপকার

খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস গ্রামের মানুষদের মধ্যে একটু আধটু থেকে গেলেও, শহুরে লোকেরা এ কথা ভাবতেও পারেন না। ইঁট-পাথরের তৈরি শহরের শক্ত মাটিতে অবশ্য তা সম্ভবও নয়। অথচ শিশির ভেজা নরম তাজা ঘাসের ওপর খালি পায়ে হাঁটা যে কতটা উপকারী, তা অনেকেই হয়তো জানেন না। অনিদ্রা ও উদ্বেগ দূর তো হয়ই, রোজ নিয়ম করে খালি পায়ে হাঁটতে শুরু করলে আরও অনেক উপকার পাবেন।

খালি পায়ে হাঁটার উপকারিতা

নেগেটিভ ইলেকট্রন শোষণ

খালি পায়ে ঘাসের ওপর হাঁটলে পা সরাসরি মাটি স্পর্শ করে। মাটি দেহ থেকে সরাসরি নেগেটিভ ইলেকট্রন শোষণ করে। এটি অভ্যন্তরীণ বায়োইলেক্ট্রিক্যাল পরিবেশের ভারসাম্যতা সৃষ্টি করতে সাহায্য

করে। এর ফলে শরীরে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। মেধার বিকাশ ঘটে।

কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি

আমাদের শরীরের ৭০ শতাংশ জল। তাই শরীর যত বেশি মাটির সংস্পর্শে আসবে ততই কর্মক্ষমতা বাড়াবে। খালি পায়ে হাঁটা শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত এবং শরীরকে শিথিল করবে।

পেশি এবং পায়ের আরাম

হঠাৎ করে শরীরচর্চা বা কোনো ভারি কাজ করার ফলে শরীরে ব্যথা হয় বা পেশিতে টান লাগে। গবেষণায় দেখা গেছে, খালি পায়ে কিছুক্ষণ হাঁটলে সেই ব্যথা অনেকটা কমে যায়। হিল দেওয়া বা অসমতল জুতো শারীরিক গড়নে যেমন প্রভাব ফেলে, তেমনই ঘাড়, পিঠ, কোমর, গোড়ালি কিংবা হাঁটু ব্যথায় কষ্ট দেয়। খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস পা-কে আরাম দেয় এবং পাতা, গোড়ালি এবং পায়ের আঙ্গুল শক্তিশালী করে তোলে।

মানসিক অবসাদে স্বস্তি এবং অনিদ্রা দূর

গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়ম করে খালি পায়ে হাঁটেন তাদের মানসিক অবসাদ অনেক কম হয়। কমে উদ্বেগও। খালি পায়ে হাঁটলে বা মাটির সংস্পর্শে থাকলে খুব ভালো ঘুম হয়। তাই অনিদ্রায় কষ্ট পেলে রোজ ভোরবেলায় খালি পায়ে ঘাসের ওপর হাঁটুন। শান্তির ঘুম হবে।

নিয়ন্ত্রণে মাইগ্রেন

ক্ষতিকারণ রশ্মির প্রভাবে মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়ে। খালি পায়ে হাঁটলে মাটির স্পর্শে ক্ষতিকর রশ্মির প্রভাব থেকে দেহ অনেকটা মুক্তি পায়। মাইগ্রেনের মাথা ব্যথায় আরাম মেলে।

রক্তের খেয়াল

খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস রক্তে শ্বেতকণিকার পরিমাণ কমিয়ে লোহিতকণিকার পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে। এর ফলে কোষের রক্ত জমাট বাধা প্রতিহত হয় যা রক্তের ঘনত্ব কমে। কমে হৃদরোগের ঝুঁকিও।

সূত্র: যুগান্তর

ট্যাবলেটের মাঝ বরাবর দাগ থাকে, কেন জানেন?

জ্বরের ওষুধ হোক কিংবা ব্যথার বিভিন্ন ধরনের ট্যাবলেটের মাঝে আড়াআড়ি একটি দাগ থাকে। কখনো মনে হয়েছে এর কোনো কারণ থাকতে পারে? কখনো ওষুধের পাতায় দুটি ওষুধের মধ্যে বেশ অনেকটা ফাঁক থাকে, আবার কোনো ওষুধে মাঝ বরাবর দাগ সব কিছুরই কারণ আছে। নয়াদিল্লির একটি হাসপাতালের চিকিৎসক সোনিয়া রানাউত বলছেন, এই দাগটিকে বলা হয় স্কোরিং লাইন। ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা এটি রাখে সহজে ওষুধ ভেঙে আধখানা করে নেওয়ার জন্য।

অনেক সময়েই চিকিৎসকরা রোগীর শরীর বুঝে কোনো কোনো ওষুধের মাত্রা মেপে দেন। কিন্তু দেখা যায়, চিকিৎসক যে মাত্রায় তা খেতে বলছেন বাজারে তা অমিল। তার চেয়ে বেশি মাত্রার ওষুধ পাওয়া যায়। যদি কাউকে ৫০০ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট খেতে বলা হয়, আর ওষুধের মাত্রা থাকে ১০০০ মিলিগ্রাম, সে ক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে তা অর্ধেক করা জরুরি। অসমান ভাগ হলে ওষুধের মাত্রা শরীরে কম নয়তো বেশি যাবে। কাজটি নির্ভুল ভাবে করার জন্য এই লাইনটি থাকে।

কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস বলেছেন, অনেক সময়ে লিভার বা কিডনির সমস্যা রয়েছে এমন রোগীর ক্ষেত্রে বেশ কিছু ওষুধের মাত্রা কমিয়ে দেওয়ার দরকার পড়ে। তখন আধখানা ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। মূলত সহজে ভাগ করার জন্যই ট্যাবলেটে এ ধরনের দাগ দেওয়া হয়।

তবে অরিন্দমের কথায়, ক্রমশই এই ধরনের দাগের যৌক্তিকতা কমছে। কারণ এই ভাগাভাগির ঝামেলা এড়াতে বিভিন্ন ওষুধ নানা মাত্রায় নিয়ে আসছে ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলো। যেমন থাইরয়েডের ওষুধ আকারে বেশ ছোট। সেগুলো ভাঙতে যাওয়া সহজ নয়। ফলে বিভিন্ন মাত্রায় তা বানানো হচ্ছে।

ওষুধের পাতায় প্রতিটি ওষুধের মধ্যে নির্দিষ্ট ফাঁক থাকে। এর কারণও আছে। কেউ পুরো পাতা না কিনে নির্দিষ্টসংখ্যক ট্যাবলেট চাইলে তা কেটে দেওয়ার সুবিধার জন্যই এ জায়গাটি থাকে। অনেক সময়ে

একটি বড় পাতায় একটি ওষুধ রেখে বাকিগুলো ফাঁকা রাখা হয়। এরও কারণও আছে। এক রাজ্য থেকে অন্যত্র পাঠানোর সময় ওষুধ যাতে ভালো থাকে সে জন্য এমন ব্যবস্থা।

সূত্র: যুগান্তর

লেবু পানি কি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

গরমকালে এটি একটি আদর্শ তৃষ্ণা নিবারক। যারা ওজন কমাতে চান তাদের জন্যও এটি একটি অলৌকিক ওষুধ। আবার ‘হ্যাংওভার’ কাটাতেও কাজ করে জাদুর মতো। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কীসের কথা বলছিলাম? বলছিলাম গ্লাস লেবু পানির কথা।

এই পানীয়টি চিনি ও সোডা জাতীয় অন্যান্য যেকোনও পানীয়ের চেয়ে কম ক্যালোরির সুস্বাদু বিকল্প। বিশেষজ্ঞরা ডায়াবেটিস রোগীদের লেবু পানি পানের পরামর্শ দেওয়ার এটি একটি প্রধান কারণ।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ৪২৫ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। সঠিক যত্ন, ওষুধের অভাব এবং দেরিতে রোগ নির্ণয় ডায়াবেটিসকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। যেসব খাদ্য আমরা গ্রহণ করি তা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ডায়াবেটিস রোগীদের পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট থেকে বিরত থাকা উচিত এবং ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার এবং পানীয় গ্রহণ করা উচিত।

এক গ্লাস সাধারণ লেবু পানি ডায়াবেটিস রোগীদের ডায়েট চার্টে একটি দুর্দান্ত সংযোজন হতে পারে। কীভাবে? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

১. লেবুর পানি রক্তে শর্করার মাত্রা সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে না বা তা কমিয়ে আনতে পারে না। তবে এর অকাল বৃদ্ধি রোধ করতে সাহায্য করতে পারে। খুব সহজেই তৈরি এই পানীয়তে কার্বোহাইড্রেট

এবং ক্যালোরি খুব কম থাকে যা শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। ডায়াবেটিস রোগীদের ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি থাকে কারণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্তে গ্লুকোজ আপনার শরীরের তরল পদার্থ কমিয়ে দেয়। তাই এটি হাইড্রেটেড থাকা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২.লেবুতে দ্রবণীয় ফাইবার থাকে, যা সহজে ভেঙে যায় না এবং রক্তপ্রবাহে শর্করার ধীর গতিতে নির্গমন নিশ্চিত করে। দ্রবণীয় ফাইবার কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে এবং রক্তচাপ স্থিতিশীল করে হৃদপিণ্ডকে সুস্থ রাখতেও সাহায্য করে।

৩. লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন লেবু, কমলা এবং আঙ্গুরের মতো সাইট্রাস ফলকে ‘ডায়াবেটিস সুপারফুড’ বলে অভিহিত করে।

৪.লেবুতে ফাইবার, ভিটামিন সি, ফোলেট এবং পটাসিয়াম রয়েছে, যা স্বাস্থ্যকর ডায়াবেটিস ডায়েটের জন্য খুবই উপকারী। ‘অ্যাডভান্সেস ইন নিউট্রিশন’ জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, লেবু এবং অন্যান্য সাইট্রাস ফলের মধ্যে পাওয়া রাসায়নিক যৌগ ন্যারিঙ্গিনেনের ডায়াবেটিস-বিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে।

লেবুর রস ছেঁকে পানি দিয়ে পান করলে এটি শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ফাইবার বা ভিটামিন সি গ্রহণের পরিমাণ নাও হতে পারে। তবে বাজারে পাওয়া সোডাজাতীয় পানীর থেকে এটি ভালো, কারণ এতে (সোডাজাতীয় পানীয়) ক্যালোরি এবং চিনি থাকে।

বাড়িতে লেবু পানি তৈরির সময় অবশ্যই তাতে চিনি মেশাবেন না। সকালে খালি পেটে এটি খাওয়া ভালো।

সূত্র: এনডিটিভি

শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি বুঝবেন

যেভাবে

আমাদের জীবনযাপনের অনেকটা সময় জুড়ে আছে চাকরি। সকালে বের হয়ে দুপুর বাইরে কাটিয়ে রাতে বাসায় ফেরা এর মাঝে খাবারটাও ঠিকঠাক পেটে পড়ে না। একদিন দুপুরের খাবার দুইটায় খেলে অন্যদিন চারটায়, কোনো কোনো দিন তো খাবারই খাওয়ার ফুরসত মেলে না। এই খাদ্যাভাস বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

মূলত বেশিরভাগ মানুষের শরীরেই এতে প্রোটিনের ঘাটতি দেখা যায়। এর অন্যতম কারণ খাদ্যাভ্যাস। প্রোটিন শরীরের খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি যেমন বেশি হলে সমস্যা, তেমনি কম হলেও। তবে শরীরে প্রোটিন কম না বেশি জানতে কিছু আগাম বার্তা পাবেন।

শরীর ফুলে যায়: প্রোটিনের ঘাটতি হলে শরীরের বিভিন্ন অংশ ফুলে যেতে পারে। এছাড়া পেশীর ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি হলে হাত ও পা ফুলে যেতে পারে। হঠাৎ এই লক্ষণ দেখা দিলে সতর্ক হোন।

অনিদ্রা: প্রোটিনের ঘাটতি বাচ্চাদের মধ্যে হলে ‘গ্রোথের’ ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। অ্যানিমিয়ার সমস্যা হতে পারে। আচমকা ওজন বাড়তে পারে। কিংবা হঠাৎ কমতেও পারে।

ত্বক ও চুলের ক্ষতি হয়: প্রোটিনের ঘাটতি হলে ত্বক ও চুলের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। চুল পড়ার সমস্যা বাড়তে পারে। চুল ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে। প্রোটিনের ঘাটতি হলে আপনার ত্বক মারাত্মক রুক্ষ, শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। ত্বকের জৌলুস একেবারেই থাকে না।

হাড়ে ব্যথা: প্রোটিনের ঘাটতি হলে পেশীর ক্ষয় হয়। ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে হাড়। অর্থাৎ প্রোটিনের ঘাটতি হাড়ের গঠনে ক্ষয় ধরায়। অল্পেই হাড় ভেঙে যেতে পারে।

সূত্র: যুগান্তর